সমকাল

তারিখ 21 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বিদ্যা শিক্ষা চাই, প্রশিক্ষণ নয়

শিক্ষা | ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচলিত আপ্তবাক্য– শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর এবং এ সূত্রে শিক্ষা মানুষ গড়ার যন্ত্র। অবশ্য শিক্ষাযন্ত্রটিকে অবশ্যই যান্ত্রিকতাহীন মানুষলগ্ন প্রক্রিয়া হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা-পদ্ধতি তো যান্ত্রিকতামুক্ত নয়। এমন বাস্তবতার প্রতিধ্বনি করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দেবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ।... ছাত্ররা দুই পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।' (শিক্ষা সমস্যা) স্কুল যেমন কল, তেমন কল মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ও; আর এমন কল রবীন্দ্রনাথের সময় ছিল, এখনও আছে ও হয়তো থাকবে। এ কারণে শিক্ষা সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রসারিত হলেও মানুষ গড়ার মহান লক্ষ্যটি অধরাই থেকে যাচ্ছে। গলদ শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতায়। অবশ্য যোগ্য শিক্ষক যে নেই তা নয়, তারা আছেন; তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। উপরন্তু সামগ্রিক ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। কারণ আমাদের সমাজের সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও গ্রেশামের তত্ত্ব কার্যকর: মন্দ টাকা ভালো টাকাকে সঞ্চালনের বাইরে ঠেলে দেয় (Bad money drives good money out of circulation)। ফল এই যে, সুশিক্ষা আমাদের হয়ে উঠছে না। আমরা যা অর্জন করছি তা প্রশ্নবিদ্ধ বিদ্যা, শিক্ষা নয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র নির্দেশনায় বিদ্যা ও শিক্ষা ভিন্নতর : 'বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। বিদ্যা আহরণের, শিক্ষা আচরণের।' আচরণগতভাবে তথাকথিত শিক্ষিতের মানুষ না হওয়া আমাদের শিক্ষার প্রধান গলদ।

তাহলে শিক্ষা কেমন মানুষ গড়ে? প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে 'শিক্ষা' শব্দটির গোড়ায় যেতে হবে। আভিধানিক অর্থে শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জন বা বিদ্যালাভ। কিন্তু গভীরতর অর্থ হলো, বিবেক-বুদ্ধির জাগরণ। সুতরাং বিদ্যা যোগ মনুষ্যত্বের জাগরণ, তবেই কিনা বলে শিক্ষা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ education, যার লাতিন মূল educere. লাতিন শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করে অর্থ করা হয় এভাবে : e মানে out; ducere মানে to lead. নিহিতার্থ হলো, মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ করে শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দও অভিন্ন অর্থে শিক্ষাকে বুঝেছিলেন। এমন শিক্ষা যেমন মানুষ তৈরি করে তার লাগসই বর্ণনা আছে শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের একটি সংলাপে : 'What a piece of work is a man! How noble in reason! how infinite in faculty! in form, in moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! The beauty of the world!' অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষ বিশ্বের সৌন্দর্য। সব ধর্মেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। তবে এই যে শ্রেষ্ঠত্ব তা অর্জন করতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক বা স্বশিক্ষার মাধ্যমে। যেমন প্রায় স্বশিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ তার স্কটল্যান্ডের বন্ধু প্যাট্রিক গেডেসের কাছে বলেছিলেন,শিক্ষিত মানুষের কথা এভাবে, 'I do not have faith in any new institution, but in the people who think properly, feel nobly, and act rightly.' যথার্থ চিন্তা, মহান অনুভব এবং সঠিক কর্ম শিক্ষিত মানুষের গুণাবলি। এমন গুণসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ অপ্রতুল। কথা তো ছিল সব শিক্ষিতেরই এমন হওয়ার; কিন্তু কেন তা হয়নি তার দিকনির্দেশক ব্যাখ্যাও আছে রবীন্দ্র-উক্তিতে। ১৮৭৭-এ মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি এবং ইতিহাসের সাল ঘটনা ও রাজাদিগের সালাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই।' স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথই নির্দেশ করেছেন যে, 'চিন্তা-শক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি।' (শিক্ষার হেরফের)

সুতরাং স্বীকৃত সত্য যে, শিক্ষা মানুষ ও সমাজলগ্ন। ইংরেজ শিক্ষাবিদ-রাজনীতিক এডওয়ার্ড শর্টের বিবেচনায়–'Education is about the way in which human beings live their lives. Its function is to improve the quality of life... It [education] is concerned with the individual and with society.' (Edward Short, Education in Changing World, London, 1971, pp. 1-2.) ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিত না করতে পারলে শিক্ষা-প্রয়াস অর্থহীন। আমাদের শিক্ষার জীবন ও সমাজবিচ্ছিন্নতার সমস্যা আজকের নয়, অতীতেও ছিল। এ কারণে রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হয়েছিল, 'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' (শিক্ষার হেরফের) কেন এই সামঞ্জস্য সাধন? কারণটি রবীন্দ্রনাথই ব্যাখ্যা করছেন এভাবে, 'আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।' (শিক্ষার হেরফের)

শিক্ষাকে সমাজলগ্ন করতে হলে শুধু যে পাঠক্রম বিশেষভাবে প্রণীত হতে হবে তা নয়; তার সঙ্গে সংযোগ হতে হবে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির সমাজমনস্কতা। সুশিক্ষক না হলে সুশিক্ষা অসম্ভব। আর সুশিক্ষক মানে শুধু মেধার নয়, সমাজলগ্ন মননের কারিগর। সুশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শুধু বইয়ের কালো অক্ষর উদগিরণ করেন না, তার বাচনিক প্রবাহে জ্ঞান ও সমাজমনস্কতার মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ফলে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞানে ঋদ্ধ হয় না, জীবন ও সমাজলগ্ন চেতনায়ও সমৃদ্ধ হয়। এমন শিক্ষার্থী এবং তার শিক্ষক সমাজ বদলের দিশারি হতে পারে।

জ্ঞানচর্চার প্রধান উপকরণ বই হলেও তা একমাত্র হওয়া অনুচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা সত্য যে, যুগ-যুগান্তের জ্ঞান ধারণ করে বই। কিন্তু চলমান জীবন ও বিরাজমান সমাজকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে না শিখলে বইভিত্তিক শিক্ষা কর্মসংস্থানের পথনির্দেশ করলেও জীবন ও সমাজকে করে বঞ্চিত। কাজেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানেই সমাজলগ্ন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। বইভিত্তিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে রবীন্দ্র-উক্তি হলো, 'সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়।... বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।' (আবরণ) কাজেই শুধু বইভিত্তিক শিক্ষা সুশিক্ষা হতে পারে না; পাঠ নিতে হয় জীবনের বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক পাঠশালা থেকেও। অধীত বিদ্যার সঙ্গে যোগ থাকতে হবে গভীর ও নিষ্ঠ জীবনবোধের। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে, যখন তিনি নির্দেশ করেন, 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।' (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) মানুষের মুক্তি মানেই যাবতীয় সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন থেকে মুক্তি। সংকীর্ণ ও কূপমণ্ডূক মানুষ উচ্চশিক্ষিত হলেও শিক্ষিত পদবাচ্য নয়। ধরা যাক একজন ম্যাক্সিম গোর্কির কথা, তিনি যে স্বশিক্ষিত হলেও সুশিক্ষিত ছিলেন তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ বক্তব্য দেওয়া যায়। নইলে তিনি কালজয়ী কথাসাহিত্যের জনক হতেন কী করে। তার একটি বইয়ের শিরোনাম My University. অথচ তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। তার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মানুষের অধিবাসের সারা পৃথিবী।

আমাদের শিক্ষা কি মানুষের মুক্তির পথনির্দেশক হতে পেরেছে? আমাদের শিক্ষা কি জীবন ও সমাজলগ্ন? প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি নেতিবাচক না হলেও সংশয়মূলক তো বটে। শিক্ষা এখন শুধু কর্মসংস্থান ও জীবিকার নিমিত্ত মাত্র; তা-ও আবার সীমিত অর্থে। কারণ আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উদ্বিগ্ন করে। এখন কর্মসংস্থানের জন্য মেধা ও যোগ্যতা নয়, বিবেচ্য রাজনৈতিক সংশ্লেষ ও অর্থবিত্তভিত্তিক সামাজিক প্রতিপত্তি

এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয় ঐতিহ্যের অনুসারী; যদিও নালন্দা বা তক্ষশীলা বলে দেয় আমাদের ঐতিহ্য এ ক্ষেত্রে ইউরোপের চেয়ে পুরনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ university, যার মূল লাতিন শব্দ universitas এবং যার অর্থ, এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশ্বমানের জ্ঞানচর্চা হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হবে 'সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন'। বিস্তৃত করে তিনি বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।' (বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়। সুতরাং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায় সর্বোচ্চ। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি এমন দায় মেটাতে পারছে বা পারলেও কতটুকু? প্রশ্নটির উত্তর সহায়ক বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের কাছেই পাওয়া যায় : আমাদের দেশে বিদেশ থেকে পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের... সম্মিলন ঘটতে পারেনি। তাছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। (বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ)

বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজারমুখী ও কর্মসংস্থান উপযোগী বিদ্যার বড় কদর; প্রয়োজনের নিরিখে যা স্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা হলো, এমন প্রয়োজনীয় বিদ্যা যুক্ত হচ্ছে না মনন চর্চার সঙ্গে। ফলে এমন বিদ্যা শিক্ষা না হয়ে প্রশিক্ষণে পর্যবসিত হচ্ছে। জানা কথা, শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের মধ্যে গুণগত ব্যবধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো, জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রদান এবং নতুন জ্ঞানের সৃজন ও সঞ্চালন। কাজেই সহমত হতে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, যখন তিনি বলেন, 'আমরা দাবি করব সেই শিক্ষার যা সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য অনুসন্ধিৎসা এনে, মানসে এমন একটা মননশক্তি জাগিয়ে তুলবে, যে শক্তি সারাটা দেশ জুড়ে তার খেলা খেলবে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইটাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ, যা একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত জীবের রস সঞ্চালনের পথ হবে, আর যা দেশের লোকের ও জাতির জ্ঞানের একনিষ্ঠার ধারাকে স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করবে।' (ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ)

আমাদের শিক্ষা কি মানুষের মুক্তির পথনির্দেশক হতে পেরেছে? আমাদের শিক্ষা কি জীবন ও সমাজলগ্ন? প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি নেতিবাচক না হলেও সংশয়মূলক তো বটে। শিক্ষা এখন শুধু কর্মসংস্থান ও জীবিকার নিমিত্ত মাত্র; তা-ও আবার সীমিত অর্থে। কারণ আমাদের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উদ্বিগ্ন করে। এখন কর্মসংস্থানের জন্য মেধা ও যোগ্যতা নয়, বিবেচ্য রাজনৈতিক সংশ্লেষ ও অর্থবিত্তভিত্তিক সামাজিক প্রতিপত্তি। আর আমাদের শিক্ষা যে জীবনে মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেনি তা বোধগম্য হয় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের চালচিত্র থেকে। যে মানুষের ছবি শেকসপিয়র এঁকেছেন, যে মুক্তমনা মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তেমন মানুষ আমাদের মধ্যে অতি বিরল প্রজাতি এবং সে কারণে এটা বলা চলে, আপাত আকর্ষণীয় প্রসারতা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা সামাজিক দায়বদ্ধতার দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো আমরা বলি, 'আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।' (শিক্ষার হেরফের)

বিধাতা-নির্ভরতায় নিয়তির মুখাপেক্ষী হওয়ার সমান্তরালে চাই মানবীয় উদ্যোগ ও কর্ম। নইলে শিক্ষার খোলনলচে পাল্টাবে না।